রাজনৈতিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক দিকও আছে। সুতরাং একথা মনে করা ঠিক নয় যে এর কেবল সমাজতাত্ত্বিক দিক-ই আছে।

○ সমাজতত্ত্বের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সম্পর্ক (Relationship of Sociology with other Social Sciences) ঃ

সমাজতত্ত্বের মত অর্থশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় নিজ নিজ পদ্ধতিতে সামাজিক সমস্যার আলোচনা করেছে। কিন্তু পৃথক হলেও এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। কোথাও কোথাও এদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে আলোচনা পদ্ধতিতে। এই সব বিজ্ঞানের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানও হয়।

পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াও বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে বিষয়বস্তু নিয়ে পার্থক্য আছে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই একটা নিজস্ব বিষয়বস্তু থাকে, কিন্তু বিষয়বস্তুর কোনো এক অংশকে নিয়েই পার্থক্য দেখা যায়। অর্থশাস্ত্র কোনো বিষয়বস্তুর আর্থিক দিকের ওপর জোর দেয়। এই দুটির বিপরীত সমাজতত্ত্ব ঐ বিষয়বস্তুর সামাজিক দিকের ওপরে জোর দেয়। সুতরাং বলা যায় বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে।

সমাজতত্ত্ব এবং অর্থশাস্ত্র (Sociology and Economics) ঃ

জ্ঞানের এই দুটি শাখার নিজেদের মধ্যে গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। মার্শাল অর্থশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে অর্থশাস্ত্র একদিকে হল ধনের বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে হল মনুষ্য সম্পর্কিত বিষয়ের এক অংশমাত্র। মার্শাল অর্থশাস্ত্রকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা করেছেন। অর্থশাস্ত্রে ধনের উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় ইত্যাদি প্রক্রিয়ার আলোচনা করা হয়।

যদি আমরা বিভিন্ন উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলিকে গভীরভাবে দেখি তাহলে দেখব এর ওপর সামাজিক সম্বন্ধ, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যের প্রভাব রয়েছে। মূল কথা হল আর্থিক ও সামাজিক সম্বন্ধ পরস্পর যুক্ত এবং সময় সময় তারা একে অন্যকে প্রভাবিত করেছে। প্রায় সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে যোগ করলে তার মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। পরিবার, জাতি, শ্রেণি ইত্যাদির মধ্যে আর্থিক বিষয়কে নিয়েই সহযোগিতা এবং সংঘর্ষ দেখা যায়।

সমাজতত্ত্ব ও অর্থশাস্ত্রের মধ্যে কতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা মার্কসের *'Das Capital'* এবং ওয়েবারের *'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism'* গ্রন্থে স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। মার্কস যদি প্রমাণ করেন যে আর্থিক কাঠামো সামাজিক কাঠামোর আধার, তাহলে ওয়েবার প্রমাণ করেন যে, ধর্ম আর্থিক সংগঠনগুলিকে প্রভাবিত করে। তাঁর মতে আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পারসন্স (T. Parsons) এবং স্মেলসর (N.J. Smelser) আর্থিক তত্ত্বকে সামাজিক তত্ত্বেরই অঙ্গ বলে মনে করেন। মিরডল (G. Myrdal)-এর 'Asian Drama' এবং হোস্‌লিটস (Bert F. Hoselitz)-এর *'Sociological Aspects of Economic Growth'*-এর মতো রচনায় সমাজতত্ত্ব এবং অর্থশাস্ত্রের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

এমন কিছু বিষয় আছে যা দুটি শাস্ত্রের মধ্যেই আলোচনা করা হয়। যেমন—নগরায়ণ, আর্থিক প্রগতি, শ্রম বিভাজন, বেকারত্ব, সামাজিক কল্যাণ, জনসংখ্যা ইত্যাদি।

সমাজতত্ত্বে মানুষের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় ; কিন্তু অর্থশাস্ত্রে সামাজিক জীবনের আর্থিক দিক নিয়েই কেবল আলোচনা করা হয়। অর্থশাস্ত্রে কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা করার জন্য প্রধানত আর্থিক কারণগুলিরই অনুসন্ধান করা হয়, কিন্তু সমাজতত্ত্বে সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক কারণগুলি নিয়েই আলোচনা করা হয়।

সমাজতত্ত্ব একটি সাধারণ বিজ্ঞান কিন্তু অর্থশাস্ত্র একটি বিশিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞান।

সমাজশাস্ত্র এবং নৃতত্ত্ব (Sociology and Anthropology) ঃ

সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। হর্সকোবিটজ্ (M.J. Herskovits) বলেছেন যে নৃতত্ত্ব মনুষ্যজাতি এবং তার কথা নিয়ে আলোচনা করে। নৃতত্ত্ব মানুষের উদ্ভব, বিকাশ এবং তার দ্বারা নির্মিত সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। সমাজতত্ত্বে মনুষ্যসমাজ এবং তার সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই দুই বিষয়ের মধ্যে মনুষ্য গোষ্ঠীসমূহের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক নিজেদের আলোচনায় একে অপরের বিষয়ের ধারণা ও তত্ত্বসমূহের প্রয়োগ করেন।

সামাজিক নৃতাত্ত্বিক প্রধানত ছোট ছোট সম্প্রদায়কে নিয়ে আলোচনা করেন ; যেমন—আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থিত সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক সংস্থাগুলির আলোচনা করা হয়। এইসব আলোচনা থেকে যে সব ধারণা বিকাশ লাভ করেছে সমাজতাত্ত্বিক সেগুলিকে আধুনিক ও জটিল সমাজের অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। পদ্ধতির দিক থেকেও নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

সামাজিক নৃতত্ত্ব (Social or Cultural Anthropology) যা নৃতত্ত্বেরই একটি শাখা। এর সমর্থকগণ যেমন—মরগ্যান, রেডফিল্ড, রেডক্লিফ ব্রাউন প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তিগণের উপস্থিতি সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে সমানভাবে লাভজনক। ভারতে এম. এন. শ্রীনিবাস, এস. সি. দ্যুবে, এন. কে. বোস, আঁন্দ্রে বেতেই (Andre Beteille) প্রমুখ নৃতাত্ত্বিকগণের বিভিন্ন আলোচনা দুটি বিষয়ের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সামাজিক নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য বেশি, বৈসাদৃশ্য কম। ভারতের ক্ষেত্রে এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

নৃতত্ত্বে প্রধানত ছোট সংগঠিত সম্প্রদায়গুলিকে নিয়েও আলোচনা করা হয়, কিন্তু সমাজতত্ত্বে আধুনিক ও জটিল সমাজব্যবস্থার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এখানে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, জটিল সমাজ ব্যবস্থার উপর নৃতাত্ত্বিক আলোচনাও হয়েছে; কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে অধিবাসীদের নিয়ে আলোচনা করার প্রবণতাই বেশি প্রচলিত।

নৃতাত্ত্বিকদের কাছে অধিবাসী সমাজ ব্যবস্থার ধর্ম, জাদু, রক্ত, বিবাহ, পরিবার, আত্মীয়তা ইত্যাদি বিষয় আলোচনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু অপরদিকে সমাজতাত্ত্বিকরা প্রধানত সামাজিক আন্তঃক্রিয়াসমূহ এবং তার থেকে উদ্ভূত সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদির ওপরই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। এছাড়া গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন সংস্থাসমূহকে নিয়ে সমাজতত্ত্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, পদ্ধতির দিক থেকে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক বেশি। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে নৃতত্ত্বে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ বেশি কিন্তু সমাজতত্ত্বে তথ্য সঙ্কলিত করার জন্য প্রশ্নমালা ও গবেষণা পদ্ধতি বেশি প্রয়োগ করা হয়। নৃতত্ত্ববিদ নিজ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু সংস্কৃতির ব্যাখ্যার খুঁজে পান, কিন্তু সমাজতাত্ত্বিকের আলোচনার বিষয়বস্তু এর থেকে অনেক বেশি ব্যাপক, সমাজতাত্ত্বিক সমকালীন বিষয়বস্তুর ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সমাজতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞান (Sociology and Psychology) ঃ

সমাজতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞান একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology) হল মনোবিজ্ঞানেরই একটি শাখা। এই শাখাটি দুটি বিজ্ঞানকে পরস্পরের নিকটে নিয়ে এসেছে।

মনোবিজ্ঞানের আলোচনার প্রধান বিষয় হল ব্যক্তি এবং তার ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের দ্বারা ব্যক্তির মানসিক স্থিতিশীলতা যেমন—আবেগ (Emotion), মনোবৃত্তি (Attitude), অভিপ্রেরণা (motivation), প্রত্যক্ষ জ্ঞান (Perception), শিক্ষা (Learning) ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

সামাজিক মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়গুলি হল ভীড়, ব্যবহার, জনমত, প্রচার ইত্যাদি। এইসব অনুশীলনলব্ধ জ্ঞান সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য। এই দুটি বিষয়ের আলোচনা পদ্ধতির দিক থেকে কিছু সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তির মানসিক বিশেষত্ব এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার-এর আলোচনা করা হয়। কিন্তু সমাজতত্ত্বে গোষ্ঠী, সংস্থা, সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদির আলোচনা হয়।

সমাজতত্ত্বে বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন করা হয় এবং গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে পারে এমন প্রভাবগুলিরও আলোচনা করা হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে কেবল সেই প্রভাবেরই আলোচনা করা হয় যা ব্যক্তির ওপর পড়ে।

ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়া অনুশীলনে মনোবিজ্ঞানের আলোচনার একটা সীমা নির্দিষ্ট করা আছে। সমাজতত্ত্বে সীমা নির্দেশ করা কঠিন। মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির সমাজের অনুশীলন করে কিন্তু সমাজতত্ত্ব ব্যক্তিগণকে নিয়ে যে সমাজ গড়ে ওঠে তার আলোচনা করে।

সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Sociology and Political Science) ঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন, রাজ্য, প্রভুত্ব, প্রশাসন ইত্যাদির অনুশীলন করা হয়। কোনো দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সেই দেশের সামাজিক পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। সুতরাং সমাজতত্ত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের গভীর সম্বন্ধ রয়েছে। ম্যাক্স ওয়েবার এবং প্যারেটো (V. Pareto) সামাজিক প্রক্রিয়াগুলিকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন, যার ফলেই তাদের মধ্যে গভীর সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব (Political Sociology), রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের মধ্যে একটি কঠিন কার্য করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বোঝার জন্য রাষ্ট্রনীতিবিদ সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন পদ্ধতি এবং তত্ত্বসমূহের প্রয়োগ করেন। এই বিষয়ে লিপসেট (S. M. Lipset), ডাল (Robert Dahl), অ্যালমণ্ড (Gabriel Almond), রুডল্ফ এবং রুডল্ফ (L. I. Rudolph and S.H. Rudolph)-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলি সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। ভোটাধিকার ব্যবস্থায় জাতির যোগদান, অন্যান্য সামাজিক কারণে যোগদান, যেমন—সঙ্কীর্ণতা, সামাজিক বিচ্যুতি ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলি সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারাই প্রভাবিত হয়।

এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক জীবনের কেবল রাজনৈতিক দিকটাকে নিয়েই আলোচনা করে। কিন্তু সমাজতত্ত্ব সম্পূর্ণ সামাজিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে।

একথাও বলা হয় যে সমাজতত্ত্বে সমস্ত রকম সংঘর্ষ এবং সংযোগের নানা প্রক্রিয়াসমূহের আলোচনা করা হয় কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সেইসব সংঘর্ষ এবং সংযোগমূলক প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয় যেগুলি রাজ্য এবং আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কোনো কোনো সমালোচকের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত বেশি আদর্শমূলক। আমাদের কেমন ও কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত এবং কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত নয় এইসব আলোচনা সমাজতত্ত্বে পাওয়া যায় না। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করা হয়, যেমন—সরকার ও নাগরিকের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত ইত্যাদি।

সমাজতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনায় অনেক ছোট ; যেমন—সমাজ, জাতি, শ্রেণি, পরিবার, গোষ্ঠী ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র বেশ বড়। যেমন—সমস্ত রাজ্য, সরকার, সংবিধান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি।

সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাস (Sociology and History) ঃ

সমাজতত্ত্বের সঙ্গে ইতিহাসের নিকট সম্পর্ক আছে। বিশেষত দুই তিন দশক আগে থেকেই পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। এর থেকে বুঝতে পারা যায় ইতিহাস কেবল বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনি নয়, সেই সময়ের সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনাও ইতিহাসে রয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বর্তমানে সামাজিক ইতিহাস (Social History) নিয়ে বেশি আলোচনা করছেন।

মার্কসের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বসমূহ প্রধানত ইতিহাসের ব্যাখ্যার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আরনল্ড টয়নবী (Arnold Toynbee) কর্তৃক রচিত *'A Study of History'* সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের মধ্যে নৈকট্য খুব বেশি। যদিও ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনায় পুরোপুরি যোগদান করে না তবুও তাদের সম্পর্ক হল গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাসের সম্পর্ক অতীতের সঙ্গে কিন্তু সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক বর্তমানের সঙ্গে। ইতিহাস হল বর্ণনামূলক কিন্তু সমাজতত্ত্ব হল বিশ্লেষণমূলক।

ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনাগুলির পুনরায় পরীক্ষা করা সম্ভব নয় কারণ এই সব ঘটনা একবারই হয়। সুতরাং এর সিদ্ধান্তকেও পুনরায় পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। সমাজতত্ত্বে সিদ্ধান্তের পরীক্ষা এবং পুনরায় পরীক্ষা সম্ভব।

ঐতিহাসিক বিশেষ বিশেষ ঘটনার আলোচনা করে কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক সাধারণ বিষয়ের আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ নেতৃত্ব সম্পর্কিত আলোচনা ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব দুটি বিষয়তেই আছে। কিন্তু যেখানে ইতিহাস বিশিষ্ট নেতৃবর্গ যেমন—নেপোলিয়ন, হিটলার, বিসমার্ক প্রমুখের উত্থান-পতনের আলোচনা করে সেখানে সমাজতত্ত্ব নেতৃত্বকে সমগ্রভাবে আলোচনা করে। সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাস আলোচনা পদ্ধতির দিক থেকেও ভিন্ন রকমের। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের মধ্যে বৈজ্ঞানিকতা আনার জন্য অনেক রকম বিধি প্রয়োগ করা হয় কিন্তু ইতিহাসে তা হয় না। সমাজতত্ত্বের বিপরীত ইতিহাসে কোনো নিজস্ব বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত নেই এবং অনুসন্ধানের কোনো নিজস্ব পদ্ধতিও নেই।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে, যদিও তাদের অস্তিত্ব পৃথক পৃথক। বর্তমানে সকল বিজ্ঞান একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। বিজ্ঞানের একটি শাখার দ্বারা সংকলিত তথ্য এবং সিদ্ধান্ত অন্য শাখার দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। আবার বিভিন্ন শাখার অনেক স্তরে সমরূপতাও দেখা যায়। সুতরাং সমস্ত বিজ্ঞানকে পৃথক মনে করা ঠিক নয়।